যুগান্তর

তারিখ ...... 8 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১-৫ ......

শিক্ষা

জয়নুল আবেদীন

প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়

গত ২৫ জুলাই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৫৮ দিন পর ফল প্রকাশ করে রেকর্ড করলেও ফলাফলের ক্ষেত্রে উচ্চমানের রেকর্ড হয়নি। ৮ বোর্ডে ৪৮৯১০২ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৩৪৪৪৪৮৫ জন। গড় পাসের হার ৭০.৪৩ ভাগ।

গতবারের তুলনায় ৪.৪২ ভাগ কম পাস করেছে। মেধার মানদণ্ড হিসেবে জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও কমেছে। শিক্ষামন্ত্রীর মতে দু'বছর আগে অর্থাৎ ২০০৭ সালে এই ব্যাচটি ৫৮ ভাগ পাস করেছিল। সে বিবেচনায় তারা গড় পাসের ৭০.৪৩ ভাগ উন্নীত করায় তিনি পরীক্ষার ফল নেতিবাচক দেখতে নারাজ। দু'বছর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রচেষ্টায় তারা যে উন্নতি করেছে তা সন্তোষজনক বলা যায়। তবে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাসের হার গতবারের চেয়ে তুলনামূলক কম হওয়ার কারণ হচ্ছে মাধ্যমিকে ইংরেজি ভাষার প্রচলিত ব্যাকরণ না শিখিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে হঠাৎ করে ইংরেজি ২য় পত্রে ৪০ নম্বরের কম্প্রিহেনসিভ প্রশ্নের বদলে ৪০ নম্বরের প্রচলিত ইংরেজি ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (ভয়েস চেঞ্জ, ন্যারেশন, টেন্স ইত্যাদি)। এর ফলে দেখা গেছে ইংরেজি প্রথম পত্রের চেয়ে দ্বিতীয় পত্রে ২০ ভাগ শিক্ষার্থীর নম্বর কমে গেছে। এ বছর ফলাফলের এ ব্যতিক্রমের মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ব্যাকরণে ভালো করেনি। এটা একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে। যে কোন ভাষার প্রাণ হচ্ছে ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ছাড়া ভাষা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। এখন থেকে মাধ্যমিকেও ব্যাকরণ শেখানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সব উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের সবচেয়ে মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলে খ্যাত রাজধানীর বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার ঝোঁক মেধাবী শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি। বুয়েট ও দেশের অন্যান্য বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ১৮ পয়েন্ট থাকলেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে। বুয়েটে আসন সংখ্যা ৮৮৫টি এবং কুয়েট, রুয়েট, চুয়েট, শাহজালাল বিজ্ঞান [illegible] প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য যে ক'টি বিআইটি আছে তা[illegible] [illegible]টির আসন সংখ্যা তিনশ' থেকে চারশ' এর মধ্যে। [illegible] মেডিকেলের আসন সংখ্যা ২২৬০টি। ১৪টি মেডিকেল একসঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় নির্বাচনী পরীক্ষা হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি কোনরকম চাপ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনী পরীক্ষা হলে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্যদের ভর্তির সুযোগ খুবই কম। অনেক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েও মেডিকেল ও বুয়েট থেকে ছিটকে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথমবর্ষে গত বছর আসন সংখ্যা ছিল ৪ হাজার। এছাড়া আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্মি মেডিকেল কলেজ আছে। সেখানে আর্মি সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত কোটা বাদে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু আসন থাকে তবে সেখানে পড়া খুবই ব্যয়বহুল। এছাড়া টেক্সটাইল, লেদার টেকনোলজি ছাড়াও কিছু টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে অভিভাবকরা খুব কমই যেতে চান। ত্রিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও আসন সীমিত। এর পরে থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজগুলো যেখানে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয়। ২০০৭ সালে ব্যানবেইজ থেকে নেয়া তথ্যানুযায়ী সরকারি অনার্স কলেজ ৪১টি, বেসরকারি অনার্স কলেজ ২০টি, সরকারি মাস্টার্স কলেজ ৬১টি, বেসরকারি মাস্টার্স কলেজ ২৮টি। এছাড়া রয়েছে সরকারি ডিগ্রি কলেজ ১৩৯টি, বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ ১০৪৮টি। বিগত দু'এক বছরের মধ্যে রাতারাতি আরও অনার্স বা মাস্টার্স কলেজ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমরা যে খোঁজখবর রাখি তাতে দেখেছি যেসব কলেজে অনার্স কোর্স এবং মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়েছে সেখানে অনার্স বা মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষক নেই বললেই চলে। কোন পিএইচডি ডিগ্রিধারী অধ্যাপক বিষয়ভিত্তিক প্রধান হিসেবে তো নেই-ই এমনকি সব বিষয়ের শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের চাপে ও রাজনৈতিক কারণে বেশ কিছু অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হলেও সেখানে হোস্টেলসহ অবকাঠামোগত সুবিধা নিতান্তই স্বল্প। শিক্ষার্থীরাও কেউ অনার্স ছাড়া পাস কোর্সে পড়তে চায় না। একে তো পাস কোর্স তিন বছরের তার ওপর তৃতীয় বিভাগ পেলে কোথাও চাকরির জন্য আবেদন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, চাকরিদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অনার্স পাস প্রার্থী পেলে পাস কোর্সের প্রার্থীদের পাত্তা দেয় না।

এছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য রয়েছে বিদেশী অনেক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার রকমারি চমক সৃষ্টিকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সংখ্যা ৫৩টি। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোন ক্যাম্পাস, নেই কোন পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরির সুবিধা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরে যাওয়া ৬৫ থেকে ৭৫ বছর বয়সের শিক্ষকরা সেখানে শিক্ষকতা করেন। জানি না তাদের পড়ানোর মতো অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সামর্থ্য আছে কিনা। আবার এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার কমে কোর্স শেষ হবে না। মেডিকেল কলেজগুলোতে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা নেয়া হয়। কাজেই এগুলো নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। মেডিকেল কলেজ, ঢাবি, বুয়েটসহ কিছু বিআইটিও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু আসন বাড়িয়ে কিছু বাড়তি শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে কিন্তু তাতে বাদ পড়া অগণিত শিক্ষার্থীর কোন লাভ হবে না। বরং তাতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোয় অধিকতর চাপ সৃষ্টি হবে এবং নানা জটিলতা বাড়বে এবং শিক্ষার পরিবেশও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। তাতেও প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়বে, শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়বে এবং মেধার বিকাশ ঘটবে। কাজেই মেধাবীদের ভর্তি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে সবার জন্য উচ্চশিক্ষা কাম্য হতে পারে না। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক লেবেলের পড়া শেষ করে বিশেষ কাজের উপযোগী একটি বিশেষায়িত কোর্স শেষ করে চাকরিতে ঢুকে পড়ে। আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অধিকতর গবেষণা ও বিশেষায়িত প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দরকার পর্যাপ্ত টেকনিশিয়ান। এজন্য প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল কিংবা ভোকেশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা জরুরি যাতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সেখানে শিক্ষালাভ করে আত্মকর্মসংস্থান খুঁজে পায় কিংবা বিদেশে গিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। আমাদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা না বাড়িয়ে দেশ, জাতি এবং সমাজের কল্যাণের জন্য জীবনকেন্দ্রিক কর্মমুখী শিক্ষা প্রয়োজন।

জয়নুল আবেদীন : *শিক্ষা গবেষক*